# বিজ্ঞানমনস্ক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমকামিতা

অঞ্জন আচার্য

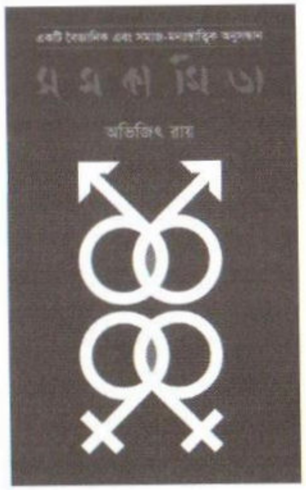


*সমকামিতা*
অভিজিৎ রায়
শুদ্ধস্বর, ঢাকা
২০১০
২৪৭ পৃষ্ঠা
৩৭৫.০০ টাকা

'সমকাম' প্রকৃতিদত্ত না বিকৃত আচরণ তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা-গবেষণা হয়ে আসছে। মূলত একই লিঙ্গের প্রতি পারস্পরিক যৌনতৃপ্তি সাধনের প্রয়াসকে বলে সমকাম। নারী বা পুরুষের উভয়ের মধ্যেই এ আকর্ষণবোধ বা অনুভূতি থাকতে পারে। সে এক সময় ছিল যখন সমকাম ঘোরতর পাপাচার বা যৌন বিকৃতি হিসেবে চিহ্নিত হতো। তা ছাড়া ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতে তো এটা ভাবনায় আনাই ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যাই হোক, সময় পাল্টেছে অনেক। তবে আপনা-আপনি পাল্টায়নি কিছুই। এর জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। অনেক অত্যাচার-নির্যাতন-লাঞ্ছনা-বঞ্চনা-অধিকারহীনতার মাঝ থেকে রীতিমতো রাজপথে আন্দোলন করে, উচ্চ আদালতের রায় নিয়ে বিজয়ী হয়ে ঘরে ফিরেছে সমকামী নারী-পুরুষেরা। বিংশ শতাব্দীর শেষে এবং একুশ-শতকের প্রথমার্ধে এসে আরোপিত এই দায় থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এক শ্রেণীর নারীবাদীর উচ্চারণ কিছুটা ভিন্নতর। তাদের মতে সমকামের অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে নারীরা পুরুষের লিঙ্গীয় আধিপত্য থেকে মুক্ত হবে। তারা আরও মনে করেন, নারীরা যদি যৌনতৃপ্তির উদ্দেশ্যে



কেবল পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে বাধ্য না হয় তবে লিঙ্গভিত্তিক সমাজের বিলুপ্তি ঘটবে, সেই সঙ্গে পুরুষের জৈবিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে। সমকামবাদের প্রবক্তাদের ভবিষ্যৎ চাওয়া হলো—নারীর জন্যে গর্ভধারণ অবধারিত কোনো বিষয় হয়ে থাকবে না। কৃত্রিম উপায়ে জন্ম হবে সন্তানের। নারীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে সে গর্ভবতী হবে কী না। যৌন তৃপ্তি আদায়ের বিষয়ে থাকবে নিষ্কণ্টক স্বাধীনতা। এ-ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরতার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অপরদিকে আধুনিক বিজ্ঞান দাবি করছে, প্রকৃতির মধ্যেই সমকামিতার স্বাভাবিক অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল। প্রাণিবিজ্ঞানের ভাষায়, প্রাইমেটগোষ্ঠীভুক্ত প্রাণী অর্থাৎ মানুষ, বেবুন, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং-এর মধ্যে সমকামিতার প্রভাব বহুলাংশে দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস তো এ অনুভূতিকে বিকৃতি বলতে একেবারে নারাজ। তাঁরা দুজনেই দাবি করেছেন, মানুষ জন্ম থেকেই উভকামী। প্রতিটি মানুষের ভেতরে সুপ্তাবস্থায় সমকামী বাসনা বিরাজমান রয়েছে।

গ্রিক শব্দ 'হোমো' শব্দের অর্থ সমধর্মী বা সমান অথবা একরূপ ধর্মবিশিষ্ট বা গুণযুক্ত। আর ল্যাটিন 'সেক্সাস' শব্দটির অর্থ যৌনতা। এ শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে 'হোমোসেক্স্যুয়ালিটি' শব্দটির উৎপত্তি। সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণকেই বলে হোমোসেক্স্যুয়ালিটি, বাংলায় যার প্রতিশব্দ সমকামিতা।

বাংলাতে এ শব্দটি এসেছে বিশেষণ পদ 'সমকামী' থেকে। ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণে দেখা যায়, সংস্কৃত 'সমকামিন' শব্দের মধ্যে এর উৎস নিহিত। 'সম' (সমান সম্যক সংযোগ সম্পর্ক সংগত অভিমুখ ইত্যাদি জ্ঞাপক উপসর্গ) এবং 'কাম' (সম্ভোগেচ্ছা)—এ শব্দ দুটির সঙ্গে 'ইন্' প্রত্যয় যোগে (সম + কাম + ইন্) গঠিত হয় 'সমকামিন' শব্দটি। আদিকালে সমকামীরা 'ঔপরিষ্টক' নামে পরিচিত ছিল। বাৎস্যায়ন তাঁর 'কামসূত্র' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধিকরণের নবম অধ্যায়ে সমকামীদের এ নামে আখ্যায়িত করেন। বর্তমান সময়ে এ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় না।

১৮৬৯ সালে কার্ল মারিয়া কার্টবেরি সর্বপ্রথম হোমোসেক্স্যুয়াল শব্দটির ব্যবহার করেন। জীববিজ্ঞানী গুস্তভ জেগার ও রিচার্ড কেইহার ভন ক্রাফট ইবিং ১৮৮০ সালে এ শব্দটির যথাযথ প্রয়োগ করে ইংরেজি পরিভাষায় এর স্থায়ী অবস্থান করে দেন।

হাল আমলে 'হোমোসেক্স্যুয়াল' শব্দটি খণ্ডিত হয়ে 'গে' এবং 'লেসবিয়ান' শব্দ দুটির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ১৯২০ সালে পশ্চিমাদেশে 'গে' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে প্রিন্টমিডিয়ার কল্যাণে এর বিস্তৃতি ঘটে। লিসা বেন নামের একজন হলিউড সেক্রেটারি 'Vice Versea : America's Gayest Magazine' নামে একটি পত্রিকার মাধ্যমে সমকামিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে 'গে' শব্দটি ব্যবহার করেন। প্রথম অবস্থায় এ শব্দটি লঘুচেতা বা হাসিখুশি মানুষকে বোঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হলেও পরে সমকামিতার প্রতিশব্দ হিসেবে তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। ১৯৬০ সালে 'গে' শব্দটি সর্বমহলে গৃহীত হয় যখন সমকামীদের অধিকার রক্ষার্থে সচেতন নাগরিক সমাজ 'Gay is good'— এরকম শ্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড বহন করে রাস্তায় নামেন। কিন্তু 'গে' শব্দটি যেহেতু পুরুষবাচক শব্দ তাই নারীবাদীরা এর বিপরীতে 'লেসবিয়ান' শব্দটির ব্যবহার ঘটান। লেসবিয়ান শব্দটি এসেছে

গ্রিসের লেসবোস দ্বীপাঞ্চল থেকে। প্রথম অবস্থায় সেই দ্বীপে বসবাসকারীদের এ নামে ডাকা হতো। তবে কথিত আছে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সাফো নামে এক নারী কবি দ্বীপের মেয়েদের একে অপরের প্রতি প্রেমবোধ নিয়ে কবিতা রচনা করেন। তাঁর মোট ৯টি কবিতার মধ্যে মাত্র ২টি উদ্ধার করা হয়েছে যার মধ্যে ১টি অসম্পূর্ণ। কবি তাঁর এক রচনায় দেবী আর্টেমিসকে উদ্দেশ্য করে বলেন, অচিরেই তিনি তাঁর ভালোবাসার নারীর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। গ্রিক লোকগাথায় আছে সাফোর সেই প্রেমিকার নাম ছিল ফাও। তবে অকালে ফাও-এর মৃত্যু হলে সাফো শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সোফো পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। তাই লেসবোস অঞ্চলের এ কবির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নারী সমপ্রেমীদের 'লেসবিয়ান' নাম প্রচলিত হয় বিশ্বব্যাপী।

পশ্চিমবঙ্গে অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু রচিত *সমপ্রেম* [দীপ প্রকাশন, কলকাতা ২০০৫] নামে সমকামিতা বিষয়ে একটি বাংলা বই আছে। তবে বাংলাদেশে অভিজিৎ রায় রচিত *সমকামিতা* বইটিই এ বিষয়ক প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাজ। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী লেখক পিএইচডি ডিগ্রিধারী অভিজিৎ রায় পেশায় একজন কম্পিউটার প্রকৌশলী। চেতনায়, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, আধুনিক ও নির্ভীক মানুষ। তাঁর পরিচালিত যুক্তিবাদী চেতনায় ঋদ্ধ দুঃসাহসিক বাংলা ব্লগ 'মুক্তমনা' [www. mukto-mona.com] বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক জনপ্রিয় ও সুধীজনের প্রশংসনীয়। সমকামিতা নিয়ে অভিজিৎ রায় সেই ব্লগে অনেকগুলো রচনা লিখেছেন। পাঠকমহলে সেইসব রচনার বিপরীতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। খণ্ডখণ্ড সে-সব রচনাসহ আরও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণভিত্তিক লেখার সংকলনে এ বইটি প্রকাশিত হয়েছে গত একুশের বইমেলায়। বইটির ফ্ল্যাপ অংশের এক জায়গায় লেখা হয়েছে—

> [...] বইটির নামকরণের মধ্যেই রয়েছে লেখকের অনুসন্ধিৎসু মননের এবং প্রথাভাঙা বিষয়বস্তুর নির্দেশ। আধুনিক জীববিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তথ্যের ভিত্তিতে স্পর্শকাতর এ বিষয়টির উদ্ভব এবং অস্তিত্বকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। বৈজ্ঞানিক আলোচনার পাশাপাশি লেখক আর্থসামাজিক, সমাজ-সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন দিক সুচারুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

বইটি দশটি ভাগে বিভক্ত – ১. 'প্রকৃতি ও সমকামিতা'; ২. 'রূপান্তরকামিতা আর উভকামিতার জগৎ'; ৩. 'উভলিঙ্গ'; ৪. 'বিবর্তনের দৃষ্টিতে সমকামিতা'; ৫. 'গবেষণার রুদ্ধ দুয়ার খুললেন যাঁরা'; ৬. 'গে মস্তিষ্ক এবং গে জিনের খোঁজে'; ৭. 'সমকামিতা কি কোনো জেনেটিক রোগ?'; ৮. 'সমকামিতা : সমাজ, ইতিহাস এবং সাহিত্যে'; ৯. 'উপাসনা ধর্মে সমকামিতা'; ১০. 'সমকামিতা ও মানবাধিকার' এবং 'পরিশিষ্ট' প্রভৃতি শিরোনামে।

প্রথম অধ্যায়ের 'সমকামিতা কি কেবল পশ্চিমা বিশ্বের বিকৃতি?' – এই উপশিরোনামে লেখক স্বীকার করেন :

> [...] আসলে সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই সমকামিতা সবসময়ই মানব সমাজে ছিল। গ্রিক, রোমান, চৈনিক, পাপুয়া নিউগিনি অথবা উত্তর আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতায় সমকামিতার অজস্র উদাহরণ আছে। সমকামিতা ছিল অ্যাজটেক ও মায়া সভ্যতায়। হিন্দু পুরাণেও উল্লেখ পাওয়া যায় পুরুষীনী অথবা তৃতীয় প্রকৃতির। [পৃ. ২২]





লেখক তাঁর এ গ্রন্থে যৌনতার বিভিন্ন স্তর, যেমন—সমকামিতা, রূপান্তরকামিতা, উভকামিতা, বিষমকামিতা বিষয়কে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির আলোকে তিনি প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন এগুলো কোনো বিকৃতি নয় বরং স্বাভাবিক মানবিক আচরণ, লেখকের মতে,

> [...] মানুষের মস্তিষ্কে হাইপোথ্যালামাস নামে একটি অঙ্গ রয়েছে, যা মানুষের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। সিমন লিভের নারীরবৃত্তীয় গবেষণা থেকে জানা গেছে, এই হাইপোথ্যালামাসের Interstitial Nucleus of the Anterior Hypothalanus বা সংক্ষেপে $INAH_3$ অংশটি সমকামীদের ক্ষেত্রে আকারে অনেক ভিন্ন হয়। ডিন হ্যামার তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায় ক্রোমোজমের যে অংশটি ($x_q^{28}$) সমকামিতা তরান্বিত করে তা শনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। এছাড়াও আরও বিভিন্ন গবেষণায় মনস্তাত্ত্বিক নানা অবস্থার সঙ্গে পিটুইটরি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, থাইমাস, এড্রিনালসহ বিভিন্ন গ্রন্থির সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়। 'গে' জিন বলে কিছু এখনও আবিষ্কৃত হয় নি, কিন্তু বেশকিছু জৈবিক ফ্যাক্টর সমকামী প্রবণতা তৈরি এবং তরান্বিত করতে পারে। [পৃ. ২৩-২৪]

> **'সমকাম' প্রকৃতিদত্ত না বিকৃত আচরণ তা বিভিন্ন মহলে আলোচনা-গবেষণা হয়ে আসছে। মূলত একই লিঙ্গের প্রতি পারস্পরিক যৌনতৃপ্তি সাধনের প্রয়াসকে বলে সমকাম। নারী বা পুরুষের উভয়ের মাঝেই এ আকর্ষণবোধ বা অনুভূতি থাকতে পারে। সে এক সময় ছিল যখন সমকাম ঘোরতর পাপাচার বা যৌন বিকৃতি হিসেবে চিহ্নিত হতো। তা ছাড়া ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতে এটা ভাবনায় আনা ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যাই হোক, সময় পাল্টেছে অনেক। তবে আপনা-আপনি পাল্টেনি কিছুই। এর জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।**

লেখক এ অধ্যায়ে অযৌন জননধারীকে 'অযৌনপ্রজ' এবং যৌনধারীকে 'যৌনপ্রজ' নামকরণ করেন। তিনি মানুষের পাশাপাশি এককোষী জীব, পতঙ্গ, সরীসৃপ এবং উদ্ভিদের বংশবিস্তার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি উল্লেখ করেন পেঙ্গুইন, হুইপ্টেল গিরগিটি, কমোডো ড্রাগনসহ বহু মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যকার যৌন আচরণ। পরিলক্ষিত হয় এদের মধ্যেও সমকাম বিদ্যমান আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক রূপান্তরকামিতা আর উভকামিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বলিঙ্গ থেকে বিপরীত লিঙ্গে রূপান্তর হওয়াকে বলে রূপান্তরকামিতা। এ বিষয়ে লেখক

প্রখ্যাত রূপান্তরকামী বিশেষজ্ঞ হেনরি বেঞ্জামিনের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন।

> [...] আপাত পুরুষের মধ্যে নারীর সুপ্তসত্তা বিরাজমান থাকতে পারে। আবার আপাত নারীর মধ্যে পুরুষের অনেক বৈশিষ্ট্য সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। [পৃ. ৩২]

হেনরি বেঞ্জামিন ছাড়াও এ নিয়ে যে-সব গবেষক, যেমন—রবার্ট স্টোলার, এথেল পারসন, লিওনেল ওভেসে প্রমুখ ব্যক্তিত্বের গবেষণাকর্ম সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন প্রাসঙ্গিকক্রমে উঠে এসেছে সেক্স এবং জেন্ডার বিষয়টি। তবে বিষয় দুটি লেখক স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন নি। তিনি বলেছেন,

> [...] বাংলা ভাষায় সেক্স এবং জেন্ডার শব্দ দুটির আলাদা কোনো অর্থ নেই, এদের সঠিক প্রতিশব্দও আমাদের ভাষায় অনুপস্থিত। [পৃ. ৩৩]

কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। 'সেক্স' শব্দের সুস্পষ্ট বাংলা অর্থ লিঙ্গ। তবে 'জেন্ডার' শব্দের কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই। অনেকে জেন্ডারের বাংলা লিঙ্গ হিসেবে আখ্যা দেন। তবে জেন্ডার অর্থ লিঙ্গ নয়। সেক্স বা লিঙ্গ মানুষের শরীরবৃত্তীয় বিষয় যা অপরবর্তনীয়। অন্যদিকে জেন্ডার মানুষের সৃষ্ট নারী-পুরুষের মধ্যকার সামাজিক আচরণ যা পরিবর্তনযোগ্য। জেন্ডারকে সামাজিক লিঙ্গ হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। অন্যদিকে উভয়কামিতা সম্পর্কে সিগমুন্ড ফ্রয়েড বলেছেন, 'পৃথিবীর সব মানুষই আসলে উভকামী' (*নারীকোষ*, মাহমুদ শামসুল হক, হাতেখড়ি, ২০০৫।) একই সঙ্গে বিষমলিঙ্গ ও সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণকে উভকামিতা বলে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এই অনুভূতিকে কখনও বিষমকামী বা কখনও সমকামী আচরণ না ভেবে ভিন্ন এক প্রকার যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবেই দেখা উচিত। লেখক এ বিষয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন এভাবে,

> [...] এটা নিশ্চিত যে, ব্যক্তির যৌনজীবনের সামগ্রিক রূপটি যদি উন্মোচিত হয়, তবে তাকে উভকামিতার পর্যায়ে ফেলাই হবে সঙ্গত। কিন্তু মুশকিল হলো, উভকামিতাকে স্বীকৃতি দিতে গেলে নারী-পুরুষের 'স্বাভাবিক' প্রথাসিদ্ধ জীবন অনেক সময়ই ভেঙে পড়ে। কারণ উভকামিতা নামক প্রবৃত্তিটি বিষমকামী সম্পর্কের সনাতন 'মনোগামিতার মিথ' টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে খুব স্বাভাবিকভাবেই। [পৃ. ৪০]

উভকামিতার উদাহরণ হিসেবে তিনি প্রখ্যাত ইংরেজ কথাসাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ড-এর উল্লেখ করেন। উভকামিতার ফলে এ লেখকের বৈবাহিক জীবনযাপন কেমন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তা তিনি তুলে ধরেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয় উভলিঙ্গত্ব নিয়ে। লেখকের মতে, প্রাণিজগতের বিভিন্ন পর্বের প্রাণীদের মধ্যে উভলিঙ্গত্ব কোনো শারীরিক ত্রুটি নয়, বরং এটি প্রাকৃতিক।

হিজড়া সম্প্রদায় এক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ঘেঁটে উভলিঙ্গত্বের বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন লেখক। আসে হিন্দু পুরাণে উল্লিখিত বৃহন্নলা বা শিখণ্ডী চরিত্র, শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি প্রসঙ্গ। বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানবদের আর্তমানবেতর জীবন নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন লেখক। বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানব বা হিজড়াদের সংখ্যা লেখক প্রায় দেড় লক্ষ বলে উল্লেখ করলেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত এক নমুনা শুমারিতে বলা হয়, এ পর্যন্ত কোনো শুমারিতে হিজড়াদের পূর্ণাঙ্গ





তথ্য সংগৃহীত হয় নি। তবে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে হিজড়ার সংখ্যা, বয়স, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক অবস্থাসহ নানা তথ্যের সংগ্রহকাজ চলছে। সংবাদপত্রের তথ্যানুযায়ী এদেশে হিজড়ার সংখ্যা ৩০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার লেখা হলেও তা পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নয়। পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে হিজড়াদের সংখ্যা নির্ধারণ করা আরও দুঃসাধ্য। সর্বভারতীয় হিজড়া কল্যাণ সভার একটি সমীক্ষায় জানা যায়, ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবছর ছয় থেকে পঁচিশ বছরের আশি হাজার পুরুষ অবৈজ্ঞানিক উপায়ে অন্ডকোষসহ পুরুষাঙ্গ কেটে হিজড়া হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক বিবর্তনের আলোকে সমকামিতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাণীদের মধ্যে ভেড়া, হাতি, সিংহ, চিতাবাঘ, হায়না, ক্যাঙ্গারু, হরিণ, জিরাফ, মহিষ, জেব্রা, শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাং, গিবন, সিয়ামাং, লঙ্গুর হনুমান, নীলগিরি লঙ্গুর, স্বর্ণ হনুমান, বানর, বেবুন– পাখিদের মধ্যে পেঙ্গুইন, ধূসর পাতিহাঁস, কানাডা পাতিহাঁস, কালো রাজহাঁস, বরফী পাতিহাঁস, মিউট রাজহাঁস, শকুন—সরীসৃপের মধ্যে কমন অ্যামিবা, অ্যানোল, গিরগিটি, স্কিনক, গেকো মাউরিং, কচ্ছপ, রাটেল স্নেক—উভচরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ, স্যালাম্যান্ডার এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মাঝে সমকামিতার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে লেখক রিচার্ড ফ্রেইহার ভন ক্রাফট ইবিং, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, ফরাসি চিন্তাবিদ দিদেরো, ফরাসি সাহিত্যিক মার্কুইস দে সাদ, এমিল জোলা, জার্মান মনোবিজ্ঞানী ম্যাগনাস হার্চফিল্ড, ফার্ডিন্যান্ড হ্যাক, এডিংটন সায়মন্ডস, ইভান ব্লোচ, ক্লারা থমসন, থিডর হেনরিখ, ইরভিং বেইবার, অটো গ্রস, হুকার, মিলার, স্কোফিল্ড, হেনরি বেঞ্জামিন প্রমুখ নাম উল্লেখপূর্বক সমকামিতা বিষয়ে তাঁদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের নিরোলাস ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমকামিতা অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর মুখ দেখে বলে লেখকের মত।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখক নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের ওপর সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তবে লেখকের মতে জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের মস্তিষ্কের গঠনগত পার্থক্য তুলে ধরা হলেও আত্মপক্ষ সমর্থনে বলা যায় এ কোনো লিঙ্গভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা নয়। তিনি আরও বলেন–

> [...] ছেলেদের মস্তিষ্কের আকার বড় হওয়ার অর্থ এ নয় যে, ছেলেদের বুদ্ধি মেয়েদের থেকে বেশি কিংবা ছেলেরা যেকোনো কাজে মেয়েদের থেকে অধিকতর দক্ষ। [পৃ. ৯১]

পুরুষতান্ত্রিক প্রথা এমনতর ভ্রান্তিকর দিক-নির্দেশনা বহুকাল ধরে টিকিয়ে রাখতে কী কী করছে তার পরিচয় এবং সত্যিকার মস্তিষ্কজনিত পার্থক্যের কারণ উল্লেখ করে লেখক নিজস্ব চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এ অধ্যায়ে।

সপ্তম অধ্যায়ে সমকামিতার সঙ্গে জেনেটিক রোগের সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে লেখকের স্পষ্ট বক্তব্য—

> [...] বিজ্ঞানীরা আজ মেনে নিয়েছেন যে, শুধু মানুষের মধ্যে নয়; সব প্রাণীর মধ্যেই সমকামিতার অস্তিত্ব আছে। কাজেই সমকামিতা প্রকৃতিজগতের একটি বাস্তবতা। আরও

> জানা গিয়েছে যে, সমকামিতার ব্যাপারটা কোনো জেনেটিক ডিফেক্ট নয়। ... বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তাররা এবং অন্যান্য অনেকেই আজ মেনে নিয়েছেন, সমকামিতা যৌনতার একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ... সমকামিতা কোনো নোংরা ব্যাপার নয়; নয় কোনো মানসিক ব্যাধি। ... পশ্চিমা বিশ্বে কোনো আধুনিক চিকিৎসকই সমকামিতাকে এখন আর 'রোগ' বা 'বিকৃতি' বলে চিহ্নিত করেন না। [পৃ, ১২৩]

অষ্টম অধ্যায়ে সমাজ, ইতিহাস এবং সাহিত্যে অনন্যস্বীকৃত ব্যক্তিত্বদের তালিকা তুলে ধরেছেন যাঁরা ছিলেন সমকামী বা নিভৃত সমকামী বা উভকামী বা রূপান্তরকামী বা সমান্তরাল যৌনতাসম্পন্ন প্রবৃত্তির মানুষ। এ তালিকায় আছেন—সোফো, সক্রেটিস, প্লেটো, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, আবু নুয়াস, সুলতান মাহমুদ, হাফিজ, বেত্তিচেল্লি, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলা, ফ্রান্সিস বেকন, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, আইজাক নিউটন, নেপোলিয়ান বোনাপোর্টসহ আরও অনেকে। ইতিহাসে, মিথে, সাহিত্য রচনায়, চৈনিক, রোমান ও গ্রিক সভ্যতায়, মধ্যযুগ এবং রেনেসাঁসে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজে সমকামিতার বর্ণনার পাশাপাশি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ও বিশ্বসাহিত্যে সমকামিতার বর্ণনা উঠে এসেছে। তবে সাহিত্যে সমকামিতা বা অন্যান্য যৌনপ্রবৃত্তি যতটা আলোচিত হয়েছে তা অন্য কোনো মাধ্যমে হয় নি। লেখক এ ক্ষেত্রটিতে দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। তিনি সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক আলোচিত রচনা যেমন বুদ্ধদেব বসুর *রাতভর বৃষ্টি*, সমরেশ বসুর *প্রজাপতি* বা *বিবর* হাল আমলে পশ্চিমবঙ্গের আলোচিত তিলোত্তমা মজুমদারের *শামুকখোল*সহ অনেক রচনায় যৌন বিবরণের কথা আলোচনা করেন নি। বাংলাদেশেরও অনেক লেখকের নাম আসতে পারতো সেই সঙ্গে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'উৎসব' গল্পে সমকামী পুরুষ যৌনকর্মীদের জীবনের কথা বিধৃত হয়েছে বলে লেখক যে দাবি করেছেন তা যথার্থ বা বস্তুনিষ্ঠ নয় বলে আমার ধারণা।

নবম অধ্যায়টি আলোচিত হয়েছে উপাসনা ধর্মে সমকামিতা প্রসঙ্গের ওপর প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ধর্মে, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিষ্ট, ইসলাম উপাসনা ধর্মে সমকামিতাকে কী রূপে দেখা হয়েছে তার বিস্তৃত উল্লেখ আছে এ অধ্যায়ে। সব ধর্মেই এ বিষয়ে প্রায় অভিন্ন মত দিয়েছে যে, এটা ঘৃণ্য এবং পাপাচার—যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতে সমকামিতার বিভিন্ন ঘটনা এক এক করে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেছেন লেখক। ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে বর্তমানে আলোচিত কিছু শাস্তিরও উল্লেখ করেছেন তিনি।

দশম অধ্যায়ে সমকামীদের মানবাধিকার বিষয়ে নানা কেইস স্টাডি উল্লেখিত হয়েছে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ যৌনপ্রবৃত্তিকে আলোচনা করা হয়েছে গভীর ও মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত দিয়ে।

পরিশিষ্ট অধ্যায়ে আছে সেক্স ও জেন্ডার বিষয় পার্থক্য, লিঙ্গ পরিবর্তন, মানব প্রকৃতির এবং প্রবৃত্তির জন্মগত ও আচরণগত আলোচনা। সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে সমকামিতাকে লেখক পরিশিষ্টে পুনরায় উদ্ধৃত করেছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। বইটিতে কী নেই তা বিচার্য বিষয় হওয়া মোটেও ঠিক নয়, বরং যা আছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বইটিতে যে-সব ভাষ্য বা তথ্য ব্যবহার করেছেন প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সূত্র যথাযথভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এতে





একদিকে উদ্ধৃত মতের উৎস যেমন জানা যাচ্ছে তেমনি আগ্রহী পাঠককে দেয়া হচ্ছে আরও গভীর অনুসন্ধানের পথনির্দেশ। এ ধরনের বইয়ে এ-রকমটাই কাঙ্ক্ষিত। তবে একটি বিষয়নির্ঘণ্ট থাকলে পাঠকদের কাছে আরো সহজ ব্যবহার্য হয়ে উঠতো বইটি। লেখক যে নিরলস পরিশ্রম করে বইটি রচনা করেছেন তা পড়েই বোধগম্য হয়। জয়তু এ প্রচেষ্টার।

**অঞ্জন আচার্য :** জন্ম ৭ নভেম্বর ১৯৮১। কবি-প্রাবন্ধিক। পেশা : প্রকাশনা সংস্থায় কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ : *জলের উপর জলছাপ* (কবিতা) [২০১০]।